ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

প্রাচ্য ফোকলোর তত্ত্ব: রবীন্দ্র মতবাদ

*প্রফেসর ড. বেলাল হোসেন

সারসংক্ষেপ: বলা যায় আধুনিক ফোকলোর চর্চার তাত্ত্বিক মতবাদের দুটি ধারা। একটি প্রাচ্য অন্যটি পাশ্চাত্য ধারা। পাশ্চত্য ধারা দ্রুত বিকশিত হওয়ায় ফোকলোর চর্চায় সম্প্রতি সারা বিশ্বেই এ ধারার প্রভাব লক্ষণীয়। বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষেও এখন এ ধারাতেই ফোকলোর চর্চিত হচ্ছে। প্রাচ্য ধারা পাশ্চাত্যে সুপরিচিত না হওয়ায় ওই অঞ্চলে ফোকলোর চর্চায় তা কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ফোকলোর চর্চায় সারা বিশ্বে যে কটি মতবাদ চালু রয়েছে তার মধ্যে প্রাচ্যধারার মতবাদটি একটি উল্লেখযোগ্য মৌলিক মতবাদ। এ মতবাদের প্রবক্তা রবীন্দ্রানাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ একজন কবি, চিত্রশিল্পী, গদ্যশিল্পী , নাট্যশিল্পী বা একজন সঙ্গীত শিল্পীই শুধু নন তিনি একজন আধুনিক ফোকলোর তাত্ত্বিকও। রবীন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় আশি বছর পূর্বে বাংলাদেশে ফোকলোর চর্চার সূচনা হলেও যথার্থ ফোকলোর চর্চার সূত্রপাত করেন রবীন্দ্রনাথই। রবীন্দ্র প্রতিভার এই বিশেষ দিকটি তুলে ধরার লক্ষ্যেই আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা।

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্ কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে ফোকলোর চর্চার সূচনা হয়। কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্‌সের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৫ জানুয়ারি ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাতে লেখা পুঁথি, মুদ্রা, চিত্র, অনুশাসন, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি নির্দশন সংগ্রহ, মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা, পাঠাগার স্থাপন এবং গবেষণামূলক পত্রিকা, বুলেটিন ও গ্রন্থপ্রকাশ ইত্যাদি ছিল সোসাইটির প্রধান কাজ।[১] এতদ্দেশে প্রতিষ্ঠার মাত্র চার বছরের মাথায় ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র *Asiatick Researches journal* প্রকাশিত হয়। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে এর নতুন নামকরণ হয় The Journal of the Asiatic Society of Bengal.[২]

১৭৮৮ থেকে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত [যদিও এর প্রকাশের ধারা পরবর্তীকালেও অব্যাহত থেকেছে এবং বহু বাক ঘুরে আজও এ ধারা অব্যাহত আছে। এ ক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ফোকলোর বিষয়ক রচনা 'ছেলেভুলোনো ছড়া' (১৩০১) প্রকাশের সময়কাল পর্যন্তকে গ্রহণ করেছি] সোসাইটির জার্নালে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজ-সংস্কৃতি-বিষয়ক এবং বাঙালির ইতিহাস, বিশ্বাস-সংস্কার, উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান, উপভাষা, লোককাহিনি, লোকগীতিকা, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, ধাঁধা, মন্ত্র, লোকক্রীড়া, লোক-অলংকার, লোকঔষধ, লৌকিক দেব-দেবী ইত্যাদি বিষয়ে দেশি-বিদেশি পণ্ডিতদের বহুবিধ প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৩]

এশিয়াটিক সোসাইটির যাত্রার প্রায় সমকালেই খ্রিস্টান মিশনারি এবং ইংরেজ সিভিলিয়নদের দ্বারাও বাংলাদেশে ফোকলোর চর্চার সূচনা ঘটে। এ পর্যায়ে বিশেষ করে উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) রেভারেন্ড উইলিয়াম মর্টন, রেভারেন্ড উইলিয়াম জেমস

* বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ।

লঙ (১৮১৪-১৮৮৭), এডওয়ার্ড টুইটি ডালটন (১৮১৫-১৮৮০), গের্বন হেনরি ডামন্ট (১৮৪৬-১৮৭৯), হার্বার্ট হোপ রিজলে (১৮৫১-১৯১২), স্যার জর্জ আব্রাহাম গিয়ার্সন (১৮৫১-১৯৪১), উইলিয়াম ক্রুক, মার্ক থর্ন হিল প্রমুখ মিশনারি ও সিভিলিয়ানরা ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে তাদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এ দেশীয় লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হন এবং সে সব সাংস্কৃতিক উপকরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। তাঁদের এ উদ্যোগ সমকালীন বাঙালি বিদ্বৎসমাজকেও আকৃষ্ট করেছিল। ফলে তাঁদের অনেকেই যেমন- রেভারেন্ড লালবিহারী দে (১৮২৪-৯৪) প্রমুখ মনীষী দেশীয় সংস্কৃতি তথা ফোকলোর চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাদের এ ধারা প্রায় অব্যাহত থাকে ফোকলোর চর্চায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (১৮৯৩) এবং রবীন্দ্রনাথের পুরোপুরি বা সক্রিয় অংশগ্রহণের (১৮৯৪) পূর্ব পর্যন্ত। এই সময়টিকেই (১৭৮৪-১৯১২ খ্রি.) ড. তিমিরবরণ চক্রবর্তী বাংলার ফোকলোর তথা লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রথম যুগ বলেছেন[৪]। তিনি দ্বিতীয় যুগ বলেছেন ১৯১৩ থেকে ১৯৪৬ খ্রি. পর্যন্ত সময়কে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ থেকে দীনেশচন্দ্র সেন ও তাঁর পরবর্তী সময়কাল পর্যন্ত এবং তৃতীয় যুগ বলেছেন ১৯৪৭ খ্রি. থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। আমরা এ তিন যুগের এবং সমকালীন বিশ্বফোকলোর চর্চার পটভূমিতে একজন ফোকলোরবিদ হিসেবে রবীবন্দ্রনাথের মূল্যায়ন করতে চাই।

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে উইলিয়াম জন থমস (Wiliim John Thoms) কর্তৃক ফোকলোর (Folkore) শব্দটির উদ্ভব ঘটলেও তার প্রায় ১৭১ বছর পূর্বে ফিনল্যান্ডে ইউরোপীয় ফোকলোর চর্চার সূত্রপাত হয়। ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে ফিনল্যান্ডে ঐন্দ্রজালিক লোকসংগীতের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে এই সংগীতের আরও পাঁচটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। এরপর ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে 'মিথোলজিয়া ফেনিকা' এবং ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফিনিশ বীরগাথা 'কালেভালা' প্রকাশের মধ্যে দিয়ে উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে ফিনল্যান্ড বিশ্ব ফোকলোর চর্চার পথিকৃতে পরিণত হয়। অবশ্য এ সময় জার্মানিতেও ফোকলোর চর্চা বেশ বেগবান হয়। যোহান গডফ্রিড হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৬) das volk (The folk) অভিধাটি গ্রহণ করে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে একটি জার্মান লোকগীতি প্রকাশ করেন। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় [জেকব গ্রিম (১৭৭৫-১৮৬৩) ও ভিলহেলম গ্রিম (১৭৭৬-১৮৫৯) তাঁদের 'রূপকথা' সংকলন প্রকাশের ফলে উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝিতেই ইউরোপে ফোকলোর চর্চা এক নতুন গতি পায়। এই গতিপথ ধরেই ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে 'ফোকলোর' শব্দের উদ্ভব ঘটে। উইলিয়াম জন থম্‌স (willim John Thoms) ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের 'দি এ্যাথেনিয়াম' পত্রিকায় লিখিত একটি পত্রে মৌখিক ঐতিহ্য বা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি অর্থে popular antiquity-র পরিবর্তে Folk-lore শব্দটির প্রথম প্রয়োগ করেন। 'ফোকলোর' শব্দটির উদ্ভবের পরপরই এর ব্যাপক বিস্তার ঘটে। ফলে ১৮৭৮ এবং ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে লন্ডনে ও আমেরিকায় 'ফোকলোর সোসাইটি' গড়ে ওঠে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপে ফোকলোর চর্চা এতোটা ব্যাপক ও বিস্তৃত হয় যে, তার ফলে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বেশ কিছু আধুনিক মতবাদ (Theories) ও পদ্ধতিবিদ্যা (Methodology) গড়ে ওঠে। এসবের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি মতবাদ ও পদ্ধতিবিদ্যাগুলো হলো:

ক. ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক মতবাদ (Historic-Geographic Method) বা তুলনামূলক পদ্ধতি (comparative Method)
খ. জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি (Nationalistic Method)
গ. নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি (Anthropological Method)

ঘ. সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি (Sociological Method)
ঙ. মনোসমীক্ষণ পদ্ধতি (Psycho-Analytical Method or Theory of psycho-Analysis)
চ. কাঠামোগত বা আঙ্গিকসংস্থান পদ্ধতি (Structural Method)
ছ. ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি (Philological Method)
জ. পরিবেশন পদ্ধতি (Performance Method)

উপর্যুক্ত মতবাদ ও পদ্ধতিবিদ্যাগুলো ১৯০০ থেকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকায় উদ্ভূত হয়ে খুব দ্রুত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ফোকলোরের আধুনিক পঠন-পাঠনে অন্যতম বিদ্যাশৃঙ্খলায় (Academic approach) পরিণত হয়।

আমরা বলতে চাচ্ছি, উপর্যুক্ত মতবাদ ও পদ্ধতিবিদ্যাগুলোর বহু পূর্বেই ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে ফোকলোর চর্চায় বা গবেষণায় প্রথম পদ্ধতিবিদ্যার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে এবং এই কাজটি করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফোকলোরের তাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর মতবাদের সরাসরি কোনো নামকরণ করেন নি। তবে তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণগুলো প্রায় সম্পূর্ণটাই নন্দনতাত্ত্বিক। সে কারণে আমরা রবীন্দ্র মতবাদটির নামকরণ করতে চাই—নন্দনতাত্ত্বিক মতবাদ ও পদ্ধতি (Aesthetical theories and Method)। ফোকলোর চর্চায় রবীন্দ্রনাথ শুধু নন্দনতাত্ত্বিক মতবাদ ও পদ্ধতিবিদ্যারই প্রবক্তা নন, একই সঙ্গে তিনি জাতীয়তাবাদী, সমাজতাত্ত্বিক এবং মনোসমীক্ষণ ধারারও প্রবক্তা। অর্থাৎ ইউরোপে এ সব পদ্ধতিবিদ্যা গড়ে ওঠার আগেই ওসব বিষয়ে কথা বলেছেন অথবা দিক নির্দেশনা বা ইঙ্গিত দিয়েছেন রবীনন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের পর প্রাচ্যে ফোকলোর চর্চার প্রভূত বিকাশ ঘটলেও অদ্যাবধি রবীন্দ্র মতবাদের বাইরে এ অঞ্চলে ফোকলোরের আর কোনো মৌলিক তাত্ত্বিক পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি এবং এর পঠন-পাঠনও রবীন্দ্র মতবাদের বাইরে খুব একটা বিকশিত হয় নি। সে কারণে আমাদের বিবেচনায় বর্তমান বিশ্বে ফোকলোরের তাত্ত্বিক পরিকাঠামোটি নিম্নরূপ:

ফোকলোর তত্ত্ব (মতবাদ ও পদ্ধতি)

প্রাচ্য		পাশ্চত্য
নন্দনতাত্ত্বিক		তুলনামূলক জাতীয়তাবাদী নৃতাত্ত্বিক সমাজতাত্ত্বিক মনোসমীক্ষণ কাঠামোগত ভাষাতাত্ত্বিক পরিবেশন পদ্ধতি ইত্যাদি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এ বিভাজনটি আমরা করছি এ কারণে যে, পাশ্চাত্যে ফোকলোর চর্চার উপর্যুক্ত মতবাদ ও পদ্ধতিবিদ্যাগুলোর বিকাশ ঘটেছে ফোকলোরকে সামাজিক বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত হিসেবে। সেখানে সমাজবিজ্ঞানের নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ফোকলোরের পঠন-পাঠন বিকশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাংলাদেশে ফোকলোর চর্চার বিকাশ ঘটেছে সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে যে সাহিত্যিক রসানুভূতি দ্বারা ফোকলোরের বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করেছিলেন সে ধারাই অব্যাহত ছিল পরবর্তী প্রায় একশ বছর। এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষ এখনো ফোকলোর বলতে বুঝে 'লোকসাহিত্য'কে। অর্থাৎ তাদের কাছে লোকসাহিত্যই হলো 'ফোকলোর'। এ ধারণার মধ্যে রবীন্দ্র প্রবর্তিত সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়ে গিয়েছে। মূলত সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ফোকলোরের একাডেমিক পঠন-পাঠন কলা ও মানবিকী বিদ্যাশৃঙ্খলার অঙ্গীভূত হিসেবে বিবেচনা করা হতো (বর্তমানে বাংলাদেশের একমাত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফোকলোর' বিভাগের একাডেমিক পঠন-পাঠন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অঙ্গীভূত বিষয় হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে)। সুতরাং বলা যায়, প্রাচ্য ফোকলোরের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্য হলো এর নন্দনতাত্ত্বিক ভিত্তি।

উনিশ শতকের শেষার্ধে এ দেশে 'ফোকলোর' শব্দের ব্যবহার শুরু হলেও[৫] শব্দটির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কোনো কথা বলেননি। বর্তমানে 'ফোকলোর' শব্দটির আভিধানিক বিস্তার ঘটলেও[৬] অতীতে এর বিষয়-বৈচিত্র্য খুব বেশি সমৃদ্ধ ছিল না। বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইউরোপেও মৌখিক সংস্কৃতি (Orally transmitted culture) অর্থাৎ ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লোককথা, লোকগীতিকা, লোকসঙ্গীত, লোককবিতা ইত্যাদিকেই কেবল ফোকলোর হিসেবে গণ্য করা হতো। এসব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকেই আমরা বলেছি রবীন্দ্র-মতবাদ।

রবীন্দ্রনাথের ফোকলোর-বিষয়ক রচনা এবং বিভিন্ন আলোচনাসমূহের মধ্যে তাঁর ফোকলোর ভাবনার স্বরূপটি নিহিত। নিচে রবীন্দ্রনাথের ফোকলোর-বিষয়ক প্রধান রচনা এবং আলোচনাসমূহের একটি তালিকা উপস্থাপিত হলো[৭]:

ক. গ্রন্থ: লোকসাহিত্য: ১৩১৪

ছেলেভুলানো ছড়া: ['মেয়েলি ছড়া' নামে মুদ্রিত] সাধনা। আশ্বিন-কার্তিক- ১৩০১।
ছেলেভুলানো ছড়া: ২ [সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। মাঘ ১৩০১ এবং কার্তিক ১৩০২।]
কবি সংগীত: সাধনা। জ্যৈষ্ঠ ১৩০২
গ্রাম্যসাহিত্য: ভারতী। ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৫।

খ. বিবিধ আলোচনা:

বাউলের গান: ['সংগীত সংগ্রহ' (বাউল গানের সংকলন) সমালোচনা] ভারতী, বৈশাখ-১২৯০।
মেয়েলি ব্রত: (অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত) ভূমিকা ১৩০৩।
ঠাকুরমার ঝুলি প্রসঙ্গে: (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংকলিত) ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকা, ভাদ্র ১৩১৪।
হারামণি (প্রথম খণ্ড): (অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন-সম্পাদিত) ভূমিকা, ১৯৩১।

গ. ভাষণ অভিভাষণ:

ভারতীয় দর্শন মহাসভার সভাপতির ভাষণ (১৯২৫)।
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতা (১৯৩০)।

ছেলেভুলানো ছড়ারও শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষমূল্য থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।[৮]

ছেলেভুলানো ছড়া: ২ এ রবীন্দ্রনাথ বলছেন:

> শুদ্ধমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশে ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।[৯]

রবীন্দ্রনাথ রসের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে শুধু ছড়াগুলো সংগ্রহই করেন নি এর নামও দিয়েছেন বাল্যরস:

> আমাদের অলংকার শাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে। কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায়। তাহা শাস্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নহে। সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তিসংতিহীন।[১০]

প্রাচীন আলংকারিকরা 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম' হিসেবে কাব্য বিচারের যে বৈশিষ্টের কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেভুলানো ছড়া'র মধ্যেই শুধু নয়, ফোকলোরের অন্যান্য উপকরণের মধ্যেও সেই রসকেই অন্বেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন :

> ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে আমি যে রসাস্বাদ করি, ছেলেবেলাকার স্মৃতি হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। সেই ছড়াগুলির মাধুর্য কতটা নিজের বাল্যস্মৃতি এবং কতটা সাহিত্যের চিরস্থায়ী আদর্শের উপর নির্ভর করিতেছে তাহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত বিশ্লেষণ শক্তি বর্তমান লেখকের নাই। ...'বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর নদী এল বান' এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো আমি ভুলিতে পারি নাই। আমি আমার সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য এবং উপযোগিতা।[১১]

ছেলেভুলানো ছড়ার বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্লেষণী পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন এককথায় বলা যায়, তা রস ও মাধুর্যের বিচার। অর্থাৎ সৌন্দর্য সৃষ্টির সার্থক প্রকাশ রূপেই এ গুলোকে দেখেছেন তিনি।

শিল্প বা সাহিত্য এবং ফোকলোরের বিচারে রবীন্দ্রনাথ পৃথক কোনো মানদণ্ড হাজির করেননি। শিল্প কী? এ কথার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'শিল্প হলো মানুষের আত্মিক শক্তির বিকাশ'[১২]। তিনি শিল্পকে 'মায়া' বলেছেন শিল্পের অসংজ্ঞেয় স্বভাবটুকু নির্দেশ করার জন্য। শিল্পকে মিথ্যা বলা তার অনভিপ্রেত। সে কারণে তিনি যে শিল্প সত্যের কথা বলেন, তা হয়ে ওঠে চিরন্তন এক সত্য। 'রিলিজিয়ন অব ম্যান' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ শিল্পকর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন-

> শিল্প হলো মহাসত্তার আহ্বানে মানুষের সৃষ্টিশীল মনের প্রত্যুত্তর। অতএব শিল্প বা আর্ট হলো মানুষের সৃষ্টিশীল আত্মার প্রকাশ।[১৩]

এই সৃষ্টিশীলতায় রস সৃষ্টিই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন এই রসেরই সন্ধান করেছেন নানা রূপে নানা ভাবে। এই রস সম্পর্কে সাহিত্যতত্ত্ব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> আমাদের অলংকার শাস্ত্রে বলেছে 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং'। সৌন্দর্যের রস আছে, কিন্তু একথা বলা চলে না যে, সব রসেরই সৌন্দর্য আছে। সৌন্দর্যরসের সঙ্গে অন্য সকল রসেরই মিল হচ্ছে ঐখানে, যেখানে সে, আমাদের অনুভূতির সামগ্রী। অনুভূতির বাইরে রসের কোনও অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয় ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুত অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা।[১৪]

এই 'তার প্রকাশ' আর 'আমার প্রকাশ' এর মধ্যেই রীবন্দ্রনাথ শিল্প, সাহিত্য এবং ফোকলোরেও চিরায়ত সত্যের সন্ধান করেছেন। তাই 'ছেলেভুলানো ছড়া'র মধ্যে তিনি শুধু সৌন্দর্যই নয়, চিরত্বেরও দেখা পেয়েছেন:

> এই চিরপুরাতন নববেদের মধ্যে যে স্নেহগাথা যে শিশুস্তবগুলি রহিয়াছে তাহার বৈচিত্র্য সৌন্দর্য এবং আনন্দ উচ্ছ্বাসের আর সীমা নেই।[১৫]

ছেলেভুলানো ছড়া'র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলোকে 'একটি আস্ত জগতের ভাঙা টুকরো' বলেছেন এবং এ গুলোর মধ্যে 'বিচিত্র বিস্মৃত সুখ দুঃখ সতত বিক্ষিপ্ত' লক্ষ করেছেন। নিম্নোক্ত উদ্ধৃটিতে রবীন্দ্রনাথের ফোকলোর ভাবনার তাত্ত্বিকতাটি নিহিত রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়:

> এই ছড়াগুলিকে একটি আস্ত জগতের ভাঙা টুকরা বলিয়া বোধ হয়। উহাদের মধ্যে বিচিত্র বিস্মৃত সুখদুঃখ শতধা-বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রতীরে কর্দমতটের উপর বিলুপ্তবংশ সেকালের পাখিদের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল–অবশেষে কালক্রমে কঠিন চাপে সেই কর্দম, পদচিহ্নরেখা-সমেত পাথর হইয়া গিয়াছে—সে চিহ্ন আপনি পড়িয়াছিল এবং আপনি রহিয়া গেছে–কেহ খোন্তা দিয়ে খুদে নাই, কেহ বিশেষ যত্নে তুলিয়া রাখে নাই–তেমনি এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কত কালের এক-টুকরা মানুষের মন কালসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এই বহুদূরবর্তী বর্তমানের তীরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে।[১৬]

উপর্যুক্ত মন্তব্য ছাড়াও 'ছেলেভুলানো ছড়া'য় রবীন্দ্রনাথের ফোকলোর ভাবনার তাত্ত্বিকতাটিকে নিম্নোক্তভাবে সূত্রাবদ্ধ করা যায়:

১. মাতৃহৃদয়ের যুগল দেবতা খোকা এবং পুঁটুর স্তব হইতে ছড়ার উৎপত্তি[১৭]।
২. ছড়ার ছবিগুলি একটি রেখা একটি কথার ছবি[১৮]।
৩. ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনা বৃষ্টিতে শিশু হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে।[১৯]

৪. ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই।... এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা[২০]।

৫. এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো[২১]।

৬. ছড়ার স্বপ্নজগৎ নিত্যস্বপ্নদর্শী বালকের নিকট তদপেক্ষা অনেক অধিক সত্য[২২]।

৭. বাস্তবিকই এই ছড়াগুলি মানসিক মেঘরাজ্যের লীলা সেখানে সীমা বা আকার বা অধিকার নির্ণয় নাই[২৩]।

৮. এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোন্‌টির কোন্‌কালে কোন্ রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্‌টা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও তাহার মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজও রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।[২৪]

৯. ছড়ার মধ্যে পুরাতন বিস্মৃত ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্ন অংশ থাকিয়া গিয়াছে। ... অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।[২৫]

১০. ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহসংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃ-পিতামহগণের শৈশব নৃত্যের নূপুরনিক্কন ঝংকৃত হইতেছে। অথচ আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোটোবড়ো অনেক জিনিস অলক্ষিতভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।[২৬]

১১. ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন নাই।[২৭]

১২. কামচারিতা কামরূপধারিতা ছড়াগুলির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য।[২৮]

উপর্যুক্ত সূত্রগুলোতে রবীন্দ্রনাথের নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও জাতীয়তাবাদী, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং কাঠামোগত বিশ্লেষণ পদ্ধতিরও কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

ছেলেভুলোনো ছড়ায় রবীন্দ্রনাথের নন্দন ভাবনাটি এমন যে তার স্বরূপ তুলে ধরতে গেলে এর প্রতিটি পৃষ্ঠাকেই উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করতে হয়। প্রতিটি ছড়ার বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ যেন নতুন নতুন নন্দন ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। দুটো একটি উদাহরণ দিয়ে এর পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ বুঝা সম্ভব নয়। তবু এখানে দুটো ছড়ার বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হলো:

আয় রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই।
মাছের কাটা পায়ে ফুটল দোলায় চেপে যাই।
...
এ নদীর জল টলমল করে।
এ নদীর ধারে রে ভাই বালি ঝুর ঝুর করে।

ছড়াটির ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> নদীর জল টলমল করিতেছে এবং তীরের বালি ঝুর ঝুর করিয়া খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে, বালুতটবর্তী নদীর এমন সংক্ষিপ্ত সরল অথচ সুস্পষ্ট ছবি আর কী হইতে পারে।[২৯]

উপর্যুক্ত দৃশ্য কাব্যের বর্ণনা আমাদেরকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্পগুচ্ছ এবং ছিন্নপত্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সঙ্গীত, এমন কি চিত্রকলায় যে নন্দন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়, ছেলেভুলানো ছড়ার প্রতিটি পৃষ্ঠায় যেন তারই প্রতিরূপ ফুটে ওঠেছে।

আয় রে আয় টিয়ে,
নায়ে ভরা দিয়ে।।
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে।
তা দেখে ভোঁদড় নাচে।
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা ॥

রবীন্দ্রনাথ ছড়াটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা শুধু চিত্তাকর্ষকই নয়, রসের বিচারেও তা অনন্য:

> প্রথমত টিয়াপাখি নৌকা চড়িয়া আসিতেছে এমন দৃশ্য কোনো বালক তাহার পিতার বয়সেও দেখে নাই। বালকের পিতার সম্বন্ধেও যে কথা খাটে। কিন্তু সেই অপূর্বতাই তাহার প্রধান কৌতুক। বিশেষত হঠাৎ যখন অগাধ জলের মধ্য হইতে একটা স্ফীতকায় বোয়াল মাছ উঠিয়া বলা নাই কহা নাই, খামকা তাহার নৌকাখানা লইয়া চলিল এবং ক্রুদ্ধ ও ব্যতিব্যস্ত টিয়া মাথার রোয়া ফুলাইয়া পাখা ঝাপটাইয়া, অত্যুচ্চ চীৎকারে আপত্তি প্রকাশ করিতে থাকিল, তখন কৌতুক আরো বাড়িয়া উঠে। টিয়া বেচারার দুর্গতি এবং জলচর প্রাণীটার নিতান্ত অভদ্র ব্যবহার দেখিয়া অকস্মাৎ ভোঁদড়ের দুর্নিবার নৃত্যস্পৃহাও বড়ো চমৎকার। এবং সেই আনন্দনর্তনপর নিষ্ঠুর ভোঁদড়টিকে নিজের নৃত্যবেগ সম্বরণপূর্বক খোকার নৃত্য দেখিবার জন্য ফিরিয়া চাহিতে অনুরোধ করার মধেও বিস্তর রস আছে। যেমন মিষ্ট ছন্দ শুনিলেই তাহাকে গানে বাধিয়া গাহিতে ইচ্ছা করে তেমনি এই সকল ভাষার চিত্র দেখিলেই ইহাদিগকে রেখার চিত্রে অনুবাদ করিয়া আঁকিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু হায়, এ সকল চিত্রের রস নষ্ট না করিয়া ইহাদের বাল্য সরলতা, উজ্জ্বল, নবীনতা, অসংশয়তা, অসম্ভবের সহজ সম্ভবতা রক্ষা করিয়া আঁকিতে পারে এমন চিত্রকর আমাদের দেশে কোথায় এবং বোধকরি সর্বত্রই দুর্লভ।[৩০]

ছড়ার মনস্তত্ত্ব বিচারেও রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি লোকছড়াকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মেঘ যেমন প্রতিনিয়ত রূপ ও রং বদলায় ছড়াও তাই। ছড়ার জগৎকে তিনি স্বপ্নের জগৎ বলেছেন। স্বপ্ন যেমন মানুষ এলোমেলো খাপছাড়া ভাবে দেখে, ছড়ার ভেতরও এ রূপ প্রত্যক্ষ করে রবীবন্দ্রনাথ বলেছেন:

> ... স্বভাবত আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধ্বনি ছিন্নবিছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বিচিত্র রূপ ধারণ করে এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়। যেমন বাতাসের মধ্যে পথের ধূলি, পুষ্পের রেণু, অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র শব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শীকর, পৃথিবীর বাষ্প—এই আবর্তিত আলোড়িত জগতের বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত উড্ডীন খন্ডাংশসকল সর্বদাই নিরর্থকভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের মনের মধ্যেও সেইরূপ। সেখানেও আমাদের নিত্য-প্রবাহিত চেতনার মধ্যে কত বর্ণ গন্ধ শব্দ, কত কল্পনার বাষ্প, কত চিন্তার আভাস, কত ভাষার ছিন্ন খণ্ড, আমাদের ব্যবহার জগতের কত শত পরিত্যক্ত বিস্মৃত বিচ্যুত পদার্থসকল অলক্ষিত অনাবশ্যকভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়।
>
> .....
>
> সহজ অবস্থায় আমাদের মানসাকাশে স্বপ্নের মতো যে সকল ছায়া এবং শব্দ যেন কোন-অলক্ষ্য বায়ুপ্রভাবে দৈবচালিত হইয়া কখনো সংলগ্ন কখনো বিছিন্ন ভাবে বিচিত্র আকার ও বর্ণ-পরিবর্তন-পূর্বক ক্রমাগত মেঘরচনা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা যদি কোনো অচেতন পটের উপর নিজের প্রতিবিম্বপ্রবাহ চিহ্নিত করিয়া যাইতো তবে তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য এই ছড়াগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়তপরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো। সেইজন্যই বলিয়াছিলাম ইহারা আপনি জন্মিয়াছে।[৩১]

ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) 'স্বপ্নব্যাখ্যা' (১৯০০ খ্রিঃ) প্রকাশের অন্তত পাঁচ বছর পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ফোকলোর বিশ্লেষণে স্বপ্নের এমন নান্দনিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের এই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে 'নন্দন মনস্তত্ত্ব' নামে অভিহিত করতে চাই। বরীন্দ্রনাথের এ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ফোকলোর বিশ্লেষণে ফ্রয়েড্রিয় ব্যাখ্যার সঙ্গে না মিললেও একথা বলা যায় যে, ফোকলোর চর্চায় রবীন্দ্রনাথই প্রথম মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটান। ছড়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণটি অভিনব এ কারণে যে, 'মানবমনের বিশ্লেষণের অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করে তিনি এত নিবিড়ভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন যে, তাতে তাকে একজন শ্রেষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক (psychologist) এর সম্মান দিতে হয়।[৩২]

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীর মতোই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, লোকসাহিত্যের কোনোকালেই কোনো রচয়িতা থাকে না। ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক ডার্খেম বলেছেন, লোকসাহিত্য কখনোই কোনো ব্যক্তি বিশেষের রচনা নয়, তা সমষ্টিক রচনা এবং বংশ পরম্পরায় বিকশিত হয়:

> A folk-song evolves gradually as it passes through the minds of different men and different generations.

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এ উপলব্ধির বহু আগেই রবীন্দ্রনাথ এ কথাটি বুঝেছিলেন।[৩৩] [সূত্র: ৮ দ্রষ্টব্য]

পাশ্চাত্যে এখন ফোকলোরকে ইতিহাসের জননী হিসেবে গণ্য করা হয়। কোনো দেশের বা রাষ্ট্রের সামাজিক ইতিহাস নিরূপণের ক্ষেত্রেও ফোকলোরের বিকল্প নেই। বিষয়টি আজকে

সমাজবিজ্ঞানীরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে অনুভব করলেও এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। [সূত্র: ৯ দ্রষ্টব্য]

বিশ্ব ফোকলোর চর্চায় জাতীয়তাবাদী মতবাদ ও পদ্ধতির উদগাতা বলা হয় জার্মানির গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়কে। ১৯২০ এর দশকে নাজী মতবাদের সমর্থনে প্রথমে জার্মানে এবং পরে রাশিয়ায় এ মতবাদ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীকালে এ মতবাদ নানা সমালোচনার সম্মুখিন হলেও বর্তমানে এর প্রয়োজনীয়তা একেবারে ফুরিয়ে যায় নি। ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে ফোকলোর চর্চার বিকাশই ঘটেছে জাতীয়তাবাদী চেতনায়। রবীন্দ্রনাথ ফোকলোরের নান্দনিকতা দ্বারা আকৃষ্ট হলেও এর মাঝে জাতীয় মননকে প্রত্যক্ষ করেছেন [সূত্র: ১০ দ্রষ্টব্য]। ইউরোপে এ মতবাদের বিকাশের আগেই রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলেছেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এর প্রতিষ্ঠা সভায় সভাপতির বক্তব্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যে কথা বলেন, ফোকলোর চর্চায় তা শুধু জাতীয় চেতনাবোধকই নয়, বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ভিত্তিকেও মজবুত করেছিল:

> দেশের কাব্যে, গানে-ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লির কৃষি কুটিরে, প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা জানিবার জন্য শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্ত না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। এই আহ্বানে তোমরা যদি সাড়া দাও, তবেই তোমরা যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে পারিবে, তবেই তোমরা সাহিত্যকে অনুকরণের বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে এবং দেশের চিৎশক্তিকে দুর্বলতার অবসাদ হইতে উদ্ধার করিয়া জগতে জ্ঞানসভায় সমাদৃত করিতে পারিবে।[৩৪]

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ আর হিটলারের নাৎসি জাতীয়তাবাদ এক নয়। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের সূত্রধরেই বিশ্বমানবিকতার পথে হেটেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর নন্দন ভাবনাই তাঁকে এ পথে পরিচালিত করেছে [সূত্র: ১, ২, ৩ দ্রষ্টব্য]।

ফোকলোরের একটি আধুনিক মতবাদ হলো কাঠামোগত মতবাদ। রুশ ফোকলোরবিদ ভ্লাদিমির জে. প্রপ এবং ফরাসি নৃতাত্ত্বিক ক্লদ লেভি-স্ট্রস বিশ শতকের ত্রিশ এবং পঞ্চাশের দশকে ফোকলোর চর্চায় কাঠামোগত পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। রবীন্দ্রনাথ সে ধরনের কাঠামোগত ব্যাখ্যা না করলেও ফোকলোরের কাঠামোগত বিচারটিও তিনিই প্রথম শুরু করেন এবং তাঁর সে ব্যাখ্যাটিও নন্দনতাত্ত্বিক। ছড়ার কাঠামো বিচার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন [সূত্র- ১১ ও ১২ দ্রষ্টব্য] তা এক কথায় অনন্য। এমন নান্দনিক কাঠামোগত ব্যাখ্যা সমগ্র বিশ্বে বিরল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলে কিছু নেই। কেননা একটি ছড়ার পাঠ (text) এর মধ্যে আরেকটি ছড়ার অথবা একই ছড়ার একাধিক পাঠ লক্ষ করলে দেখা যায়– মিশ্রণ (এক ছড়ার সঙ্গে আরেক ছড়ার মিশ্রণ) ছড়ার কাঠামো নির্মাণে অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে। ছড়ার এই বৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- ছড়ার 'কামচারিতা কামরূপধারিতা'। ছড়ার এমন বিশুদ্ধ নান্দনিক কাঠামোগত ব্যাখ্যা আর কী হতে পারে!

কবি সংগীত একটি ছোট প্রবন্ধ হলেও এতে কবিগানের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর তাত্ত্বিক মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। প্রাচীন সাহিত্যের প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পূর্বকালের গানগুলি হয় দেবতার সম্মুখে নয় রাজার সম্মুখে গীত হইত'। কিন্তু কবিগানগুলো জনগণের জন্য রচিত। সুতরাং এতে জনরুচিই প্রাধান্য পায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> শ্রোতারাও বেশি কিছু প্রত্যাশা করে না- কথার কৌশল, অনুপ্রাসের ছটা এবং উপস্থিতমত জবাবেই সভা জমিয়া উঠে এবং বাহবা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে; তাহার উপরে আবার চারজোড়া ঢোল, চারখানা কাঁসি এবং সম্মিলিত কণ্ঠের প্রাণপণ চিৎকার; বিজনবিলাসিনী সরস্বতী এমন সভায় অধিকক্ষণ টিকিতে পারেন না। সৌন্দর্যের সরলতায় যাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, ভাবের গভীরতায় যাহাদের নিমগ্ন হইবার অবসর নাই, ঘন ঘন অনুপ্রাসে অতি শীঘ্রই তাহাদের মনকে উত্তেজিত করিয়া দেয়।[৩৫]

কবিগানে সাহিত্যরসের চেয়ে ক্ষণিক উত্তেজনাই প্রধান। শুধু কবিগানই নয়, পারফরমিং ফোকলোরের বৈশিষ্ট্যই হলো ক্ষণিক উত্তেজনা। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটি হলো:

> কিন্তু সাধারণের যতই রুচির উৎকর্ষ ও শিক্ষার বিস্তার হউক না কেন তাহাদের আনন্দ-বিধানের জন্য স্থায়ী সাহিত্য এবং আবশ্যক-সাধন ও অবসররঞ্জনের জন্য ক্ষণিক সাহিত্যের প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে।[৩৬]

গ্রাম্যসাহিত্য প্রবন্ধে একদিক রবীন্দ্রনাথের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় যেমন বিধৃত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি তাঁর ফোকলোরের তাত্ত্বিক ভাবনার পরিচয়টিও মেলে। জমিদারি দেখাশোনার কাজে বাংলাদেশে এসে রবীন্দ্রনাথ 'লোকসংস্কৃতির যে রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পান তা সযত্নে দু'হাত ভরে কুড়িয়ে নিয়ে তাকে পল্লবীত ও বিকশিত করে তোলেন গানে, কবিতায়, সাহিত্যে'[৩৭]।

গ্রাম্যসাহিত্য প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> একদিন শ্রাবণের শেষে নৌকা করিয়া পাবনা-রাজশাহীর মধ্যে ভ্রমণ করিতে ছিলাম। মাঠ ঘাট সমস্ত জলে ডুবিয়াছে। ছোটো ছোটো গ্রামগুলি জলচর জীবের ভাসমান কুলায়পুঞ্জের মতো মাঝে মাঝে জাগিয়া আছে। কূলের রেখা দেখা যায় না শুধু জল ছলছল করিতেছে; ইহার মধ্যে যখন সূর্য অস্ত যাইবে এমন সময়ে দেখা গেল প্রায় দশ-বারো জন লোক একখানি ডিঙি বাহিয়া আসিতেছে। তাহারা সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে এক গান ধরিয়াছে এবং দাঁড়ের পরিবর্তে এক-খানি বাঁখারি দুই হাতে ধরিয়া গানের তালে তালে ঝোঁকে ঝোঁকে ঝপ্ ঝপ্ শব্দে জল ঠেলিয়া দ্রুত বেগে চলিয়াছে। গানের কথাগুলি শুনিবার জন্য কান পাতিলাম, অবশেষে বারম্বার আবৃত্তি শুনিয়া যে ধুয়াটি উদ্ধার করিলাম তাহা এই–
>
> যুবতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী।
> পাবনা থ্যাহে আন্যে দেব ট্যাহা-দামের মোটরি॥
>
> ভরা বর্ষার জলপ্লাবনের উপর যখন নিঃশব্দে সূর্য অস্ত যাইতেছে এ গানটি ঠিক তখনকার উপযুক্ত কি না সে সম্বন্ধে পাঠকমাত্রেরই সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু গানের এই দুটি চরণে সেই শৈবালবিকীর্ণ জলমরুর মাঝখান হইতে সমস্ত গ্রামগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিল। দেখিলাম, এই গোয়াল-ঘরের পাশে, এই কুল গাছের ছায়ায়, এখানেও যুবতী

> মন ভারী করিয়া থাকেন এবং তাঁহার রোষারুণ কুটিলকটাক্ষপাতে গ্রাম্যকবির কবিতা ছন্দে-বন্ধে সুরে-তালে মাঠে-ঘাটে জলে-স্থলে জাগিয়া উঠিতে থাকে।[৩৮]

এখানেও রবীন্দ্রনাথের ফোকলোরিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নন্দনতাত্ত্বিক। তিনি গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যে আনন্দের যে সুর শুনেছেন তাতে গ্রাম বাংলার সহজ-সরল স্বাভাবিক জীবনের কাব্য-রসেরই সন্ধান করেছেন:

> গ্রাম্যসাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবির, গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে; সেইজন্যই বাঙালির কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে।[৩৯]

গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ হরগৌরীর দাম্পত্য ও সাংসারিক জীবন এবং কৃষ্ণরাধার প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি হগৌরীর গানকে সমাজের গান এবং রাধাকৃষ্ণের গানকে সৌন্দর্যের গান বলেছেন:

> আমাদের দেশের রাধাকৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্যবৃত্তি এবং হরগৌরীর কথায় হৃদয়বৃত্তির চর্চা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ধর্ম প্রবৃত্তির অবতারণা হয় নাই। ... সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যে নাই।[৪০]

গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শুধু সৌন্দর্যবৃত্তিই অন্বেষণ করেন নি, ছেলেভুলানো ছড়ার মতো এখানেও তিনি গভীর সমাজতাত্ত্বিকতারও পরিচয় দিয়েছেন। মৌখিক সাহিত্যের সঙ্গে যে লিখিত সাহিত্যের একটি গভীরতর যোগসূত্র রয়েছে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথই প্রথম তা গভীরভাবে অনুভব করেন। 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি বলেন:

> গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে; তাহা বিশেষরূপে, সংকীর্ণরূপে দেশীয়, স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য; সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না।[৪১]

বাংলাদেশের সাহিত্যের ধারা বা বিষয়বস্তু কী হওয়া উচিত উপর্যুক্ত মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ যেন সে দিক-নির্দেশনাই দিয়েছেন।

১২৯০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় বাউলগানের সংকলন 'সংগীত সংগ্রহ' এর যে সমালোচনা লেখেন এবং ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় দর্শন মহসভার অধিবেশনে সভাপতির যে ভাষণ দেন, তাতেও তাঁর গভীর নন্দন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। বাউল গানের রস বিচারে তিনি বলেছেন:

> The man of my Heart; to the Baul, is like a divin instrument perfectly tuned. He gives expression to infinite truth in the music of life. And the longing for the truth which is in us, which we have not yet realised, breaks out in the following baul song:
>
> Where shall meet him, the man of my heart?
> He is lost to me and I seek him wondering from land to land.[৪৫]

বাউলগানের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এক নতুন জীবন লাভ করেন। মূলত রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবন দর্শন এই বাউল গানকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে এবং এখানেই তিনি তাঁর জীবনদেবতার সন্ধান লাভ করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতায় তিনি সে কথা স্বীকার করে বাউল গানের রস সম্বন্ধে বলেন:

> It spoke of an intense yearning of the heart for the divine which is in Man and not in the temple, or scriptures, in images and symbols.
>
> ...
>
> I felt that I had found my religion at last, the religion of man inwhich the infinite become defined in humanity and came close to me so as to need my live und co-operation. This idea of mine found at a later date its expression in some of my poems addressed to what I called Jivan-devata, the lord of my life?[৪৩]

বাউলগানের ভেতর শুধু জীবন দেবতার সূত্রই নয়, এর ভেতর যে সাহিত্যিক মূল্য থাকতে পারে এ বিষয়ে শিক্ষিত বাঙালির সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রবীন্দ্রনাথ। বাউলগানের রসসৌন্দর্য ও সর্বমানবিক ঐক্যের বন্ধন লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ 'হারামণি'র ভূমিকায় লিখেছেন:

> আমাদের দেশের ইতিহাস প্রয়োজনের মধ্যে নয়, মানুষের অন্তরের গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি-এ জিনিস হিন্দু- মুসলমান উভয়েরই একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে সাক্ষাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে। কোরআন পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিপদে বিরোধে বর্বরতা। বাংলাদেশের গ্রামে গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা স্কুল-কলেজের অগোচরে আপনি-আপনি কি রকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু- মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।[৪৪]

রবীন্দ্রনাথ ফোকলোরের সকল উপাদান উপকরণের মধ্যেই নান্দনিকতা খুঁজেছেন। সেই নান্দনিক চেতনা থেকেই তিনি পদ্মার চরে বোটে বসবাস করার সময় মাটির ঘরের মডেল, নকশিকাঁথা, শিকা, আলপনার বিভিন্ন নকশা ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। এ সময় তাঁর অন্যতম সংগ্রাহক সঙ্গী ছিলেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 'মেয়েলি ব্রত' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> সাধনা পত্রিকা সম্পাদনকালে আমি ছেলে ভুলানো ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। ব্রতকথা সংগ্রহে অঘোরবাবু আমার প্রধান সহায় ছিলেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

অনেকের নিকট এই সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং এরূপ দুঃসহ গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমানকালে বঙ্গসমাজে অতিশয় সুলভ হইয়াছে।

...

সাধনায় যখন আমি এগুলো সংগ্রহ ও প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম তখন আমার কোনো প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুধাভাণ্ডার যে অন্তঃপুর, তাহারই প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববশতঃ আকৃষ্ট হয়ে আমাদের মাতা মাতামহী, আমাদের স্ত্রী কন্যা সহোদরদের কোমলহৃদয়পালিত মধুরকণ্ঠ লালিত চিরন্তন কথাগুলোকে স্থায়ীভাবে একত্র করতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং অঘোরবাবুকে এই সমস্ত মেয়েলি ব্রত গ্রন্থ আকারে রক্ষা করিতে উৎসাহী করিয়াছি, সেইজন্য গম্ভীর প্রকৃতির পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং সেই সঙ্গে একথাও বলে রাখি যে, এই সকল সংগ্রহের দ্বারা ভবিষ্যতে যে কোনো প্রকার গম্ভীর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না এমনও মনে করি না।[৪৫]

ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের নন্দনতাত্ত্বিক এবং জাতীয়তাবাদী দুটি মতবাদেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেষ্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের "Fairy Tales" আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে। তাঁদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোন কোন স্থলে মার্টিনের এথিক্স এবং বার্কের ফরাসী বিপ্লবের নোট বই বাহির হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু কোথায় গেল– রাজপুত্র পাত্তরের পুত্র, কোথায় বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, কোথায়– সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের সাত রাজার ধন মাণিক!

পালা পার্বণ যাত্রা গান কথকতা– এ সমস্তও ক্রমে মরানদীর মত শুকাইয়া আসাতে, বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত, সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বয়স্কলোকদের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে। তাহার পরে দেশের শিশুরাও কোন পাপে আনন্দের রস হইতে বঞ্চিত হইল। তাহাদের সায়ংকালীন শয্যাতল, এমন নীরব কেন? তাহাদের পড়াঘরের কেরোসীন্-দীপ্ত টেবিলের ধারে যে গুঞ্জনধ্বনি শুনা যায় তাহাতে কেবল বিলাতী বানান-বহির বিভীষিকা। মাতৃদুগ্ধ একেবারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলি ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে।

...

এই যে আমাদের দেশের রূপকতা বহুযুগের বাঙালীবালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ন চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্য্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের এই চিরপুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।

অতএব বাঙালির ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে– সমস্ত বাংলাদেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়।[৪৬]

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা ফোকলোরের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে রবীন্দ্র মতবাদটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে আমরা বলার চেষ্টা করেছি যে, রবীন্দ্র ভাবনায় বিভিন্ন মতবাদের সংযুক্তি ঘটলেও তিনি মূলত মনে প্রাণে একজন নন্দনতত্ত্ববাদী। তবে তার এই নান্দনিক ভাবনা কখনোই 'শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্বের অনুগামী নয়। আমরা পূর্বে বলেছি, রবীন্দ্রনাথের মতে, 'শিল্প হলো মানুষের সৃষ্টিশীল আত্মার প্রকাশ'। ফোকলোরও তাই। আধুনিককালে ফোকলোরকে প্রদায়ী ও গ্রহীতার মিথস্ক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা হয়। ড্যান বেন আমোস ফোকলোরের যে নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন 'Artistic communication in small groups'[৪৭] সেখানেও এই সৃষ্টিশীলতাকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ কারণেই ফোকলোর চর্চায় রবীন্দ্রনাথের নন্দন ভাবনা সম্বন্ধে ড. ক্ষেত্রগুপ্ত যা বলেছেন তাকে যথার্থ বলেই মনে হয়–

> স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লোকসৃষ্টির নান্দনিক মূল্যায়নে বারংবার প্রবৃত্ত হয়েছেন। বিচার-বিবেচনার প্রচলিত রীতিনীতির বাইরে চলে গিয়েছেন। তা শুধু মনীষীবিশেষের দামী ভাবনা বলে একপাশে সশ্রদ্ধভাবে সরিয়ে রাখার ব্যাপার নয়। এর মধ্যে একটা বিদ্যাশৃঙ্খলার আহ্বান আছে, আছে একটা বিশিষ্ট স্কুলিং। মন্ত্রহীন ব্রাত্যদের লোকসৃষ্টির একটা অধিকারের কথা।[৪৮]

রবীন্দ্রনাথের এই নান্দনিক ভাবনা শুধু সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরই নয়, ফোকলোরিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরও জনয়িতা। ফোকলোর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা শুধু বিষয়টির প্রতি সাময়িক আকর্ষণের ফল নয়, প্রসঙ্গক্রমে কথিতও নয়। 'তিনি এর গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করেছিলেন, এর মধ্যে জাতির শিকড়ের বন্ধন অনুভব করেছিলেন এবং লোকসাধারণের বিকল্প রচনা ও জীবনসাধনাকে দেখতে পেয়েছিলেন। সে কারণে ছড়ার বিস্তৃত সমালোচনায়, গ্রাম্যসাহিত্যের ব্যাখ্যানে, যাত্রার পরিবেশনের অনাড়ম্বর স্বাতন্ত্র্যে, কবিগানের আলোচনায়, বাউল সংগীত ও বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায় এবং বিভিন্ন ভাষণ-অভিভাষণে একটি সমান্তরাল সৌন্দর্য সন্ধানের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। ফোকলোরের বিষয় বাস্তব জীবন এবং পরিচিত পৃথিবী। এর সঙ্গে অবাস্তব, আজগুবি, অতিকাল্পনিক স্বপ্নময় পরাবাস্তব জগৎ– যা আসলে বাস্তবতারই প্রতিরূপ– এরই নান্দনিক ব্যাখ্যা দাড় করিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই আজ বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ফোকলোর চর্চার বিকাশ ও বিস্তার। রবীন্দ্রনাথ যে জাতীয় চেতনা এবং নান্দনিক বোধ থেকে ফোকলোর চর্চা শুরু করেছিলেন বাংলাদেশে আজও প্রায় সে ধারাই অব্যাহত আছে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৬১-১৯৫৩), ড. দীনেশ চন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯), দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭), আশুতোষ চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪৪), চন্দ্রকুমার দে (১৮৮৯-১৯৪৬), ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (১৯০৪-১৯৮৭) প্রমুখ মনীষী রবীন্দ্রনাথের ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ড. আশরাফ সিদ্দিকী (জ.১৯২৭), ড. মযহারুল ইসলাম (১৯২৮-২০০৩), আবদুল হাফিজ (১৯৩৫-২০০৫) এবং পশ্চিম বাংলায় ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৮৪) প্রমুখ ফোকলোর পণ্ডিতেরা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেই পাশ্চাত্য ধারার ফোকলোর চর্চায় উৎসাহী হয়ে উঠেন। এঁরা সবাই বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চায় অনেক অবদান রাখলেও

ফোকলোরের মৌলিক তাত্ত্বিক মতবাদ সৃজনে (আমরা যাকে বলছি- ফোকলোরের প্রাচ্য মতবাদ) এখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই একক ও অনন্য।

বর্তমানে বিশ্ব ফোকলোর চর্চায় রবীন্দ্র-নির্দেশিত নান্দনিক মতবাদের কিছুটা রূপান্তর বা পরিবর্তন ঘটেছে বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ অনেকটা সাহিত্যিক (ভরত-আনন্দবর্ধন-অভিনবগুপ্ত-বিশ্বনাথ প্রমুখ নির্দেশিত এবং তাঁর নিজের অভিমত) নন্দনতত্ত্ব দ্বারা তাঁর ফোকলোরিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু বর্তমানে ফোকলোরের নন্দনতত্ত্বে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিও গৃহীত হয়েছে। আর এ ধারার প্রবর্তক ইজরায়েলি ফোকলোরবিদ হেডা জেসন। তিনি ১৯৭৭ সালে 'এথনোপোয়েট্রি: ফর্ম, কনটেন্ট, ফাংশন' নামক গ্রন্থে এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ করেন।

বর্তমানে রূপক, প্রতীক, সংকেত, ভঙ্গি, ধ্বনি, মুদ্রা, সুর, তাল, লয়, রেখাবিভঙ্গ, বর্ণ, ঐতিহ্যাশ্রিত অনুভব এবং কল্পনা এই সব কিছু মিলিয়েই গড়ে ওঠে ফোকলোরের নন্দন–প্রতীতি।[৪৯]

রবীন্দ্রনাথ রূপক, প্রতীক বা সংমিশ্রিত প্রতীক বিষয়ে তেমন কিছু বলেননি। কিন্তু আধুনিক নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় (যদিও বিষয়টি কাঠামোগত বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়) রূপক, প্রতীক, সংকেত ইত্যাদিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয় এ কারণে যে এগুলোর মাধ্যমে মানুষের নান্দনিক অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। এ কারণে ফোকলোরের নন্দনতত্ত্বের সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে ড. পবিত্র সরকার বলেছেন:

> ...লোকজীবনের নানা বস্তুগত, ভাষাগত, প্রদর্শনমূলক বা অভিকরণযোগ্য সংস্কৃতিবস্তু কেবল সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য রচিত হয় না, তার আরও নানা কাজ (functions) থাকে। এই কাজগুলি সেই সংস্কৃতি-বস্তুর দ্বারা সম্পন্ন হয় বলেই লোকসংস্কৃতির নানা সৃষ্টিকর্মের একটা মূল্য বা value তৈরি হয়ে যায়। লোকজীবনে এই মূল্যবস্তুর একটিই হল সৌন্দর্য।[৫০]

যে কোনো বিদ্যাশৃঙ্খলাতেই তাত্ত্বিক মতবাদ একটি চলমান প্রক্রিয়া। ফোকলোরও এর বাইরে নয়। উনিশ শতকের শেষ পাদে রবীন্দ্রনাথ ফোকলোর চর্চার যে ধারা চালু করেছিলেন আজ তা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হতে চলেছে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা ও অগ্রগামিতা।

তথ্যসূচি:

---

১ ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল: বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ইতিবৃত্ত, অনার্য, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৫২

২ পূর্বোক্ত: ১৫২

৩ পূর্বোক্ত: ১৫৩

৪ তিমিরবরণ চক্রবর্তী: বাঙলা লোকসংস্কৃতি চর্চার আদিযুগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৫

৫ Hugh Fraser ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে তাঁর একটি প্রবন্ধের শিরোনামে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম 'ফোকলোর' শব্দটির ব্যবহার করেন 'Folklore from Eastern Garkhpur JL-1883 1

ii (1), 1-32; একই পত্রিকায় বাঙালিদের মধ্যে শরৎচন্দ্র মিত্র ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'ফোকলোর' শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন- Bengali and Behari Folklore abut Birds, JL-1898-1xvii (3), 67-74, JN-1899 1xivv (3), 14-29; এছাড়াও সোসাইটির জার্নালে একাধিক ব্যক্তি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'ফোকলোর' শব্দটি ব্যবহার করে বিভিন্ন শিরোনামে প্রবন্ধ লেখেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল; পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯-১৬০

৬ 'সাংস্কৃতিক জীবনের সৃষ্টিমুখী দিক, যেগুলোর উদ্ভব ঐতিহ্যের আশ্রয়ে সম্ভব হয়েছে এবং যেগুলোর বস্তুতে, শিল্পে ও সাহিত্যে, আচার ব্যবহারে, অঙ্গভঙ্গিতে প্রতিফলিত ও প্রতিরূপিত হয়েছে এই জাতীয় ঐতিহ্যমুখী উপাদান যেগুলো সৃষ্টির ও স্থিতিশীলতার পশ্চাতে কালের পরীক্ষা (Test of time) বিদ্যমান, সেগুলোই ফোকলোর'।
ড. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, অবসর প্রকাশ-২০১২, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ.৬৮।

৭ রবীন্দ্রনাথের বিশাল রচনাসমূহের প্রায় সর্বত্রই ফোকলোর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র প্রধান প্রধান ফোকলোর বিষয়ক রচনা বা আলোচনাসমূহকেই কেবল এ তালিকায় স্থান দেয়া হয়েছে।

৮ রীবন্দ্রনাথ ঠাকুর: লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী- ১৯১৪, পৃ. ৫

৯ পূর্বোক্ত: পৃ. ৪৯

১০ পূর্বোক্ত: পৃ. ৪৯

১১ পূর্বোক্ত: পৃ. ৬

১২ সুধীর কুমার নন্দী: নন্দনতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৪পৃ. ২৭৮

১৩ পূর্বোক্ত: পৃ. ২৭৯

১৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: সাহিত্যের পথে- সাহিত্যতত্ত্ব পৃ. ১১৪

১৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, ১৯১৪, পৃ. ৪১

১৬ পূর্বোক্ত: পৃ. ৩২-৩৩

১৭ পূর্বোক্ত: পৃ. ৪১

১৮ পূর্বোক্ত: পৃ. ২১

১৯ পূর্বোক্ত: পৃ. ৪৮

২০ পূর্বোক্ত: পৃ. ৭

২১ পূর্বোক্ত: পৃ. ৯

২২ পূর্বোক্ত: পৃ. ১৪

২৩ পূর্বোক্ত: পৃ. ১৮

২৪ পূর্বোক্ত: পৃ. ৭

২৫ পূর্বোক্ত: পৃ. ১৫-১৬

২৬ পূর্বোক্ত: পৃ. ৪৯

২৭ পূর্বোক্ত: পৃ. ৫০

২৮ পূর্বোক্ত: পৃ. ৫০

২৯ পূর্বোক্ত: পৃ. ২৩

৩০ পূর্বোক্ত: পৃ. ২৬

৩১ পূর্বোক্ত: পৃ. ৭-৮

৩২ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: ঐতিহ্য আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২৫

৩৩ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২, পৃ. ১১৩-১১৪

৩৪ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: পূর্বোক্ত: পৃ. ১০

৩৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: লোকসাহিত্য, পৃ. ৭৮-৭৯

৩৬ পূর্বোক্ত: পৃ. ৮৫

৩৭ আশুতোষ ভট্টাচার্য: পূর্বোক্ত: পৃ. ১০৫

৩৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: লোকসাহিত্য, পৃ. ৮৭

৩৯ পূর্বোক্ত: পৃ. ৯০

৪০ পূর্বোক্ত: পৃ. ১২০

৪১ পূর্বোক্ত: পৃ. ৯১

৪২ বিনয় ঘোষ: রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি, রবীন্দ্রায়ন, ২য় খণ্ড (পুলিনবিহারী সেন-সম্পাদিত) কলকাতা, ১৩৬৮, পৃ. ৬৮

৪৩ Bipinchandra Paul:. Golden Book of Tagore:, Calcutta, 193, 1p. 31

৪৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন: হারামণি, প্রথম খণ্ড (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত ভূমিকা) কলকাতা, ১৯৩১

৪৫ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (সংকলিত): ১৩০৩। মেয়েলি ব্রত (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ভূমিকা)

৪৬ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার: বাংলাদেশ সংস্করণ-২০০৫, কথারূপ লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৩১৪ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ভূমিকা)।

৪৭ Dan Ben Amos: Folklore in context Essays, New Delhi, 1982, p. 28.

৪৮ ক্ষেত্রগুপ্ত: কারিকা-লোকনন্দনিকা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা ১৪:৪, মাঘ-চৈত্র ১৪০৮, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, ১৪০৮, পৃ. ৪০৭

৪৯ পল্লব সেনগুপ্ত: লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩২৮

৫০ পবিত্র সরকার: লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব। কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৫৩